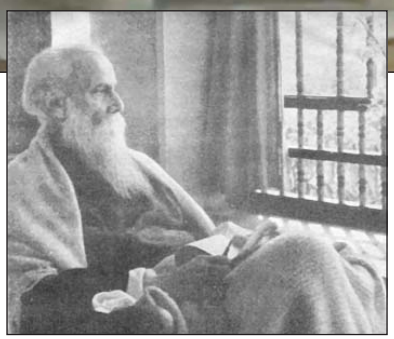

রবীন্দ্রনাথের ঘরবাড়ি এবং স্থাপত্য ভাবনা

স্থপতি **কিশওয়ার হাবিব**

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ***'সৌন্দর্যবোধ একটা সাধনা, একটি প্রবল শক্তি। যে জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারদিকে মস্ত একটি সরলতার অবকাশ থাকা চাই।'*** আজ দূষণ আক্রান্ত জীবনে পরিবেশমুখী স্থাপত্যের মূল্য অপরিসীম। প্রকৃতিকে নিয়ে গড়া শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও স্থাপত্য, বর্তমানকালের স্থাপত্য নির্মাণের চিন্তাভাবনায় পরিবেশ সংরক্ষণে একটি দিকনির্দেশনা দেয়। প্রকৃতি ও স্থানীয় উপাদানসামগ্রী সমন্বয়ে নির্মিত রবীন্দ্রনাথের স্থাপনাগুলো কখনোই যেমন ব্যয়বহুল হয়ে ওঠেনি, তেমনি শিল্প ও জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুতও হয়নি। বিভিন্ন সময়ে অনেকেই একে টেগোরিয়ানা নামেও চিন্তা করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। ১৮৬৩ সালে রায়পুরের ভুবন মোহন সিংহদের কাছ থেকে ২০ বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় (মৌরসীপাড়ায়) গ্রহণ করেন। এই জনশূন্য প্রান্তে একটি অতিথিশালা স্থাপন করে তার নাম দিলেন **'শান্তিনিকেতন'**। এই বাড়ির নামেই ক্রমে জায়গাটার নাম দাঁড়িয়ে গেল **'শান্তিনিকেতন'**। জনশূন্য এই প্রান্তরের কাঁকর বিছানো রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে, অন্য স্থান থেকে মাটি এনে সবুজায়নের পরিকল্পনা করে নানা রঙের গাছ লাগানো হয়। ধীরে ধীরে রঙের পরে রঙ, প্রাণের পরে প্রাণ, সবুজে সবুজে শ্যামলীমার পূর্ণতায় ভরে ওঠে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ। তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর এই আশ্রম বেশিদিন নিজের কাছে রাখেননি। ১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ ট্রাস্ট ডিড করে শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। আশ্রমে ব্রাহ্মোপাসনার জন্য পৃথক মন্দির না থাকায় ১৮৯০ সালে মন্দির নির্মাণ করা হয়।

১১ বছর বয়সে কিছু দিনের জন্য কবি শান্তি নিকেতনে এসে থাকলেও, ১৯০১ সালে ৪০ বছর বয়সে শিলাইদহ ছেড়ে স্থায়ীভাবে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। এতোদিন পর্যন্ত কবি বিভিন্ন সময়ে থেকেছেন প্রাসাদ সদৃশ বাড়িগুলোতে, কিন্তু শান্তিনিকেতনে তিনি চলে এলেন একেবারে বিপরীত মেরুতে, একেবারে মাটির কাছাকাছি, প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে। শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় পরিবার নিয়ে থাকার নিয়ম ছিল না। তাই শালবীথির পূর্ব সীমানায় খড়ের চালের **'নতুন বাড়ী'** নামে একটি ঘর বানিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে এটি 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'র কার্যালয়। এ বাড়ির পূর্ব দিকে ছোট দোতলা 'দেহলি' বাড়ি বানান ১৯০৪ সালে। এ ঘরে ওঠার আগেই তার স্ত্রী মৃণালিনীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি একা ১৯১৯ সালে উত্তরায়ণে যাবার আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর এ বাড়িতে থেকে শান্তিনিকেতনের তদারকি করেন।

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। এ সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্থাপত্য ও সংস্কৃতি খুব কাছ থেকে দেখবার, জানবার সুযোগ হয় তার। বিশেষ করে জাপান ভ্রমণে। জাপানি স্পেসের সুনিপুণ ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পরে তাঁর শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য ভাবনায় উত্তরায়ণে যার রূপায়ণ খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তরায়ণ, কোনো বাড়ির নাম নয়। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীকেতন যাবার পথে ছাতিম তলার উত্তর দিকের এলাকাটি 'উত্তরায়ণ' নামে পরিচিত। এর নির্মত স্থাপত্যগুলো, রবীন্দ্রচিন্তায় ও পরিকল্পনায় নানা রূপে, বৈচিত্র্যে, সম্মিলিত ছন্দে একই sky-line-এ প্রকাশিত। উত্তরায়ণের এলাকায় কোনার্ক, উদয়ন, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী এই পাঁচটি বাড়িই মুখ্য। এই বাড়িগুলোতে রবীন্দ্রনাথ তার শেষ জীবনের দুই দশক সময় কাটিয়েছেন। শান্তিনিকেতন গৃহস্থাপত্য নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মুখ্য ভূমিকায় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ করের মতো গুণী ও অসামান্য চিত্রীকে যুক্ত করেছিলেন। স্বার্থক প্রযুক্তিবিদ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সৃষ্টিকর্মে ব্যাপকতা ও গভীরতা আসে।

উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম কোণে শিমুল গাছের পাশে প্রথম খড়ের চালা, পেটা মেঝের দুটি মাটির বাড়ি নির্মিত হয়। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ এ বাড়িতে উঠেছিলেন। এই মাটির ঘর দুটিই ১৯২১-২২ সালের দিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে নির্মাণ করা হয়, নাম দেয়া হয় **'কোনার্ক'**। বাড়িটি গড়ে

উঠেছে উঁচু ভিতের ওপর, বিভিন্ন space অনুযায়ী উচ্চতার ভিন্নতা রয়েছে। যেমন- কোনার্কের দোরগোড়ায় কাঁকর মাটির তল, বারান্দার তল, ৯ ইঞ্চি উপরে ঘরের মেঝের তল আবার প্রায় দুই ফুটেরও বেশি ভেতরের ঘরের তল। বিভিন্ন উচ্চতার তলবিশিষ্ট *পুরো* বাড়িটি ছন্দে বিন্যস্ত মঞ্চঘরের রূপ দেয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'নটীর পূজা' এক সময় এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কোনার্ক গড়ে উঠেছিল open ended structure পদ্ধতিতে। নানা সময়ে এটি বিভিন্ন মাত্রায় সম্প্রসারিত এবং নতুনভাবেও বিন্যস্ত হয়। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত দিগন্ত দেখা যায় এমন উঁচু ঘরের কথাই ভেবেছিলেন, তাই উঁচু ভীতের ওপর থামযুক্ত উঁচু ঘর তৈরি হয়, নিচুতলে শোবার ঘর, স্নানঘর ইত্যাদি ছিল। পরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খাবারের ঘর যুক্ত করা হয়। বড় ঘরটি ঘিরে দুই ধাপ নিচে; সারি সারি কলামের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল কোনার্কের বিখ্যাত লাল বারান্দা। আলো-বাতাসের জন্য এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার passage-এর দুই পাশেই কাচের জানালা দেওয়া হয়। অন্দর সজ্জায় প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কাঠের প্রচলিত আসবাপত্র ব্যবহৃত হলেও পরে নতুন উদ্ভাবনী কংক্রিটের তৈরি আসবারপত্র ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ছিল শোবার খাট, পড়ার টেবিল, তাক, ছোট বসবার জায়গা প্রভৃতি।

১৯২৬ সালের দিকে পুনরায় কোনার্কেও নানা অংশ পুনর্গঠিত হয়। আলো-বাতাসের প্রাধান্যই ছিল সবচেয়ে বড় বিষয়। আর তাই বড় জানালা দেওয়া হয়, যা দেওয়ালের আয়তন বা অংশ থেকেও অনেক বেশি। এ সময় কোনার্কের পাকা ছাদ করা হয়। ইস্পাতের বীম, পেটাই টালির ছাদ, ইস্পাতের থামগুলো কংক্রিট অলঙ্কারে ঢেকে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিভিন্ন উচ্চতার তলের কারণে এ বাড়িতে প্রায় ১৪টি ছাদের ব্যবহার করা হয়েছে। ছাদে কংক্রিটের বসার জায়গাও করা হয়েছিল। তল বিভাজনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি চিন্তার রূপ পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন, ***'তল বিভাজনে এক ছাদের ছায়া আরেক ছাদে এসে পড়বে।'*** ছায়ায় বেঞ্চিতলে বই পড়া বা প্রকৃতির দিগন্তকে দেখার উপভোগ্যতা স্থাপত্য অঙ্গে পেতে চেয়েছিলেন।

১৯২০-২১ সাল থেকে প্রায় দীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছর ধরে বিভিন্ন বিন্যাসে নানা মাত্রায় নির্মিত স্থাপত্য রূপ উদয়ন; যা ১৯৩৮ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ হয়। শুরুর দুটি ঘরের একটিতে ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী প্রতিমা দেবীর ঘর, অপরটি খাবার ঘর আর তার সাথে লাগানো রান্নাঘর। মূলত এর নকশা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন সময়ে বাড়িটির নানা অংশের যোগ

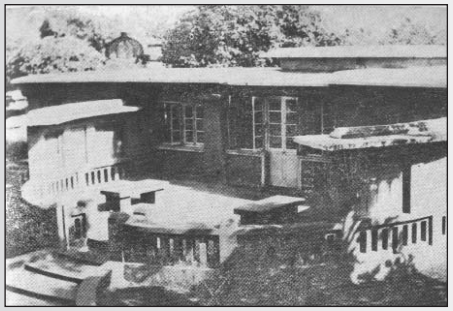

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিভিন্ন দেশের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। এ সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্থাপত্য ও সংস্কৃতি খুব কাছ থেকে দেখবার, জানবার সুযোগ হয় তার। বিশেষ করে জাপান ভ্রমণে। জাপানি স্পেসের সুনিপুণ ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পরে তাঁর শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য ভাবনায় উত্তরায়ণে যার রূপায়ণ খুঁজে পাওয়া যায়

হয়েছে। ফলে পুরো বাড়িটির সবচেয়ে চমৎকার দিকটি হয়েছে এর ঘরগুলোর মধ্যকার তল বিভাজন ও উচ্চতার বৈচিত্র্য। অনেক লম্বা সময় ধরে নির্মাণের পরও পুরো ভবনটিতে এক ধরনের ঐকতান দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘর এবং এর সঙ্গে লাগানো স্নানঘরটি বেশি ব্যবহার করতেন। দোতলার রাজস্থানের ছোট বারান্দা ও জানালা, কংক্রিটের জালির কাজ দেখা যায়। ভেতরে শীতলপাটি ও কাঠের পাল্লার দেয়াল, কাঠের কারুকাজের সিলিং, নিচু বেদীতে বসার ব্যবস্থা, ডিভান কৌচ, খাবার টেবিল, লেখার টেবিল, শেলফ্। মোঘল স্টাইলের কাঠের কমোডের সঙ্গে মোজাইক করা নকশা বেসিন, ব্যবহারিক বাথ শেলফ সবই অভিনব ডিজাইন এবং ব্যবহারিক রূপে সহজ-সরল ও উপযোগী করে নির্মিত।

বসার ঘরটি একতলার মাঝখানে রয়েছে, অন্দর সজ্জায় জাপানি শৈলীর নিপুণ কাঠের কাজের জানালা, দরজা, রেলিং, কাঠের ফ্রেম, কাঠের কাজে ঢাকা celing ইত্যাদি কাঠের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চারদিকে বসার জায়গা, মাঝখানটা ফাঁকা। সেখানে কবির উপস্থিতিতে হতো অনুষ্ঠানের মহড়া, সাহিত্য পাঠ, সভা-সমিতি ইত্যাদি।

প্রাচ্যের বৈঠকি মেজাজে এর প্রভাব এসেছে বাড়ির সাথের বারান্দায়। বিদ্যালয় অথবা নানান অনুষ্ঠানে ও কাজে হলঘর ও বারান্দা ব্যবহৃত হতো। বৌদ্ধিক থাম, এর সঙ্গে ধাপসহ বারান্দা, ভেতরের সঙ্গে বাইরের মেলবন্ধন বাড়ির সম্মুখভাগে মেরামে ঢাকা অঙ্গন এবং জাপানি বাগান বিশেষজ্ঞ কিনতারা কাসাহারার সহায়তায় নির্মিত জাপানি উদ্যান, বসবার তোরণ সবই উদয়ন গঠনরীতিতে প্রাচ্য শিল্প ঐতিহ্যেরই নিদর্শন বহন করে। এখনকার আধুনিক ভবনগুলোতে যেমন একই space বা ভবনের বিভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, সেই সময়ে উদয়ন একাধারে performing art center, official area, living center এই তিনের সার্থক মেলবন্ধন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক স্থাপত্যে স্পেস বিভাজনে উচ্চতার ভিন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সময়ে, রবীন্দ্র ভাবনায়, কোনার্কে এবং উদয়নে সহজ সুন্দর সার্থক বাসের সঙ্গে সঙ্গে তলের বিভাজন, উচ্চতার বৈচিত্র্যের স্থাপত্য ছন্দে প্রাণবন্ত গৃহ স্থাপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে ***'শেষ সপ্তক'***-এ লিখেছেন, ***'আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি/ বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে/ তার নাম দেব শ্যামলী।'***

কোনার্কের পূর্বদিকের বাড়িটিই **'শ্যামলী'**। ১৯৩৫ সালের মে মাসে জন্মদিনের শুভক্ষণে শ্যামলীতে প্রবেশ করলেন কবি। মাটির দেওয়াল, মাটির ঢালু ছাদ, ঘরের চৌকাঠ ছিল না, সিঁড়িও না। রবীন্দ্রনাথের মূলভাব ছিল, ***পথ আর ঘরের তফাতই বোঝা যাবে না, পথ আপনি এসে ঢুকবে ঘরে'***। মূল ডিজাইন করেছেন সুরেন কর। শিল্পী নন্দলাল ও রাম কিঙ্করের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে এ বাড়ি। পুরো বাড়িটির পরিকল্পনা করেন রথীন্দ্রনাথ। শ্যামলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখেন, ***আমার মাটির ঘরটাও তৈরি হলো- খুব চমৎকার হয়েছে; একটা দেখার মতো জিনিস, ছাদটাও মাটির- এই ব্যাপারটা অভূতপূর্ব, পল্লীবাসীরা যদি খড়ের চালের বদলে মাটির ছাদ করতে পারে, তাহলে সেটা তাদের***

বিস্তর কাজে লাগবে, আগুনের ভয় থাকবে না। আর খড় গরুকে খাওয়াতে পারে।' মূলত মাটির বাড়ির স্থায়িত্বের সমস্যা, স্বল্প ব্যায়ে নির্মাণ, আগুনের হাত থেকে রক্ষার উপায় ইত্যাদির সমাধান হিসেবে শ্যামলী বাড়ির পরিকল্পনা করা হয়।

শ্যামলী নির্মাণে নির্মাণসামগ্রী হিসেবে মাটির সঙ্গে গোবর, আলকাতরা আর বেনা গাছের টুকরো মেশানো মসলায়, সারি সারি মাটির হাঁড়ির ওপর হাঁড়ির সেটিং তৈরি দেয়ালে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া হয়। আলকাতরা দেওয়ার কারণ পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্তি, এছাড়াও এর দেয়াল তৈরিতে cavity wall-এর ধারণা কাজে লাগানো হয়েছিল। দেয়ালের মাঝখানে বাতাস থাকায় গরম বা ঠান্ডা সহজে ঢুকতে পারে না। ফলে আরামদায়ক পরিবেশ পাওয়া যায়। এছাড়া বীম হিসেবে তালের কাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। *'মাটির ঘর চোখে দেখতে যেমন ভালো, বাসের পক্ষে তেমনি। ঘরগুলো বিভক্ত অথচ একটি মাত্র ঘর, দরজার নিষেধ সংকেত নেই--।'* space planning-এর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারণার সার্থক প্রতিফলন পাই অন্দর সজ্জায় যেখানে খোলামেলা আবহকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। space planning-এর ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন মাত্রায় স্থানগুলোকে ভাগ করা হয়েছে।

'মন নিজেকে যতখানি ছাড়াতে চায়, ততখানি ছাড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের ওপর ঠোকর পড়ে না।' রবীন্দ্রনাথ আসবাবপত্রের পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয়তা, উপভোগ্যতা ও পরিমিতিবোধের মেলবন্ধন চেয়েছিলেন, আর তাই মাটির বাড়ির স্থাপত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে অন্দরসজ্জায় সাধারণ আসবাবের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মাটির তৈরি বসার জায়গা, চারদিকের বারান্দার আস্তরণ, ছোট-বড় দেয়াল, শোবার ঘর, কাজের জায়গা- সব মিলিয়ে ৫০০ sqft-এর এই বাড়িটি সহজ-সরল স্থাপত্যে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। বাড়ির সামনের ফাসাদে বৌদ্ধ চৈত্যের আদলে হাই রিলিফের ভাস্কর্যের কাজ রয়েছে, দরজার দুই পাশে সাঁওতাল সাঁওতালি, সাঁওতাল দম্পতি রামকিঙ্কর বেজের করা, পূর্বের দেয়ালে 'ঘোড়া' নন্দলাল বসুর করা, কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের করা শ্যামলীর চারদিকের দেয়ালের রিলিফ। দরজার কাছেই জ্যাম, পশ্চিমে কাঠ টগর গাছের পরিকল্পনা, চারিধারে লেবুর গাছ, এর সুগন্ধ এ সবই theme architecture-এরই প্রতিফলন।

প্রাচ্যের বৈঠকি মেজাজে এর প্রভাব এসেছে বাড়ির সাথের বারান্দায়। বিদ্যালয় অথবা নানান অনুষ্ঠানে ও কাজে হলঘর ও বারান্দা ব্যবহৃত হতো। জাপানি বাগান বিশেষজ্ঞ কিনতারা কাসাহারার সহায়তায় নির্মিত জাপানি উদ্যান, বসবার তোরণ সবই উদয়ন গঠনরীতিতে প্রাচ্য শিল্প ঐতিহ্যেরই নিদর্শন বহন করে

শ্যামলী স্থাপত্যশিল্প, উদ্যানশিল্প, রিলিফ, ভাস্কর্যশিল্পের সমন্বিত রূপের সার্থক নির্মাণ। মূলত শ্যামলী একটি প্রতীকী নির্মাণ, এর দিকনির্দেশনা আছে, বর্তমানে mud architecture-এর ব্যবহার দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই এ কাজ করিয়ে দেখিয়ে গেছেনে তার প্রিয় শান্তিনিকেতনে। শ্যামলী বাড়িটিতে নানা সময়ে থেকেছেন- গান্ধীজি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, বিনোবাভাবে, মাদার তেরেসা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' তাই শ্যামলী বাড়ির পূর্বদিকে পুনশ্চবাড়ি গড়ে উঠল কবির ইচ্ছায়। শ্যামলীকে কবি চিহ্নিত করেছিলেন তার জীবনের শেষ বাড়ি বলে। কিন্তু তারপর এই বাড়ি হলো বলে এ বাড়ির নাম দিলেন **পুনশ্চ**। পুনশ্চ গড়ে উঠেছে, পোড়া মাটি, বহুমাত্রিক কংক্রিটের বাড়ির ছাদের রেখার সঙ্গে, ইটের তৈরি বৌদ্ধিক ধাঁচের থাম, দেয়ালের সঙ্গে ইস্পাতের বীম-সংলগ্ন সমতল টালির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে। মাঝখানের ঘরটির উচ্চতা সবচেয়ে বেশি, পূর্ব ও পশ্চিমের কাচে ঢাকা ঘর দুটির উচ্চতা কমিয়ে দিনের আলো আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে এ বাড়িতে থাকাকালীন interior furniture-এও ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন রবীন্দ্রনাথ যা তার প্রয়োজন ও পরিমিতিবোধের এক সহজ-সরল রূপে প্রতিষ্ঠিত। কাঠের বাক্সগুলোতে একাধারে storage ও বসবার জায়গা এবং একত্রিত করে শোবার জন্য ব্যবহার করতেন। Terrace-এর দুই বিপরীত কোণে ছাদবিহীন উন্মুক্ত জানালা দিয়ে আলো-ছায়ার অসাধারণ বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। এছাড়াও বাড়ির সামনে উচ্চতার বৈচিত্র্যের তলের উদ্যান, সবুজের সমারোহের মাঝে interior এবং outdooor-এর মেলবন্ধন রচনা করেছে। গাছের বাহার ও লতানো সবুজ পাতার সমারোহের পাশেই বসার ও কাজের বেদী রয়েছে। খুব ভোরে পূর্বদিকের বারান্দার কোণে প্রথম আলোতে ধ্যান করতেন রবীন্দ্রনাথ। দিনে ওখানে বসেই তিনি কাজ করতেন। লেখা ছাড়াও রবীন্দ্র চিত্রকলার নানান সৃষ্টি হয়েছিল এই বাড়িটিতেই।

পুনশ্চের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দোতলা বাড়িটিই হলো **'উদীচী'**। ১৯১৬ সালে

জাপান ভ্রমণের সময় জাপানি আদর্শ বাড়িগুলোর simple এবং space utilization-এর design তার মনে খুব দাগ কেটেছিল। তাদের বাড়ির space-এর পরিমিতিবোধ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, ***'বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায়নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে।'*** পুনশ্চ বা উদীচী যেন সেই ব্যবহারিক স্থাপত্য ও তার সত্য উপলব্ধিরই প্রতিরূপ। ১৯৩৮ সালে এই বাড়িটি তৈরি হয়। রবীন্দ্রজীবনের শেষ বাড়ি। প্রথমে চারটি থামের ওপর দোতলায় একটি ঘর ও তার সঙ্গে একটি বারান্দা তৈরি হয়েছিল, পাশ থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলার ঘরে, নিচের চারদিক খোলা, landscaping করে প্রকৃতিকে কাছে নিয়ে আসা হয়। পরে কবির ইচ্ছা অনুসারে নিচের column ঘিরে ঘরের সংখ্যা বাড়ানো হয়। বসার ঘরের সঙ্গে ঝোলানো বারান্দা, north Indian architecture-এর আদলে floor পর্যন্ত লম্বা জানালা, মুঘল স্থাপত্য রীতির উপরিভাগ বিন্যস্ত জানালা এবং রাজস্থানী স্থাপত্যের ছোঁয়া পাওয়া যায় বাড়িটিতে। উদীচীর floor planning, চাতাল, সংলগ্ন সিঁড়ি, বারান্দা, প্রাকৃতিক বিন্যাস, সব মিলিয়ে duplex বাড়ির সার্থক নিদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্র আদর্শে এবং রথীন্দ্রনাথের নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, উত্তরায়ণে নানা রকম ফুল, ফলের গাছ, বন, নানান লতাপাতা, বাহারী মেলা, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় মৌসুমি ফুলের বাহারে নানা গাছের বৈচিত্র্যের মেলার সৃষ্টি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বনবাণী কাব্যে যেমন, তেমনি পরিবেশ, প্রকৃতির, উদ্যানের সঙ্গে সক্ষের কথা তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে, গানে, গল্পে, কবিতায় পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে নানা রকম নিয়ে এসে, উত্তরায়ণে, নন্দনে, মালঞ্চ চত্বরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। গাছঘর, পম্পালেক, গোলাপ বাগান, কোনার্কের পেছনে নানা রকম কাঁটা গাছের সঙ্গে ক্যাকটাস জাতীয় ফুল-কাঁটার বিন্যাস, পাথুরে কলসীতে উদ্যান বিন্যাস, মৃন্ময়ী চাতালের কোণে মৌসুমি ফুল, মালঞ্চের বাগান, উদয়নে জাপানি ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন, গুহাঘর এবং চিত্রভানু তোরণ, স্থাপত্য সব মিলে অসাধারণ উদ্যান পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন উদ্যান পরিকল্পনায় স্নানঘরের পানির ধারা বিভিন্ন মাত্রায় কখনো surface drain আবার কখনো জমির তলার নালা হিসেবে বাগান চর্চার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। কঠিন মাটি থেকে সবুজ প্রাকৃতিক যে সম্পদ গড়ে উঠেছিল, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও সমৃদ্ধির জন্য সুসংহত বাগান পরিচালনাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। স্থানীয় লাল কাঁকরে মাটিতে পানি মিশিয়ে নিলে এই মাটির ওপরে শক্ত বাঁধুনি হয়, তাকে ঘর, বাড়ি, রাস্তা, গৃহনির্মাণে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল।

উপাসনা মন্দিরের পাশে শ্রীনিকেতনগামী রাস্তার ধারে, একটি তাল গাছকে কেন্দ্র করে গোলাকৃতি খড়ের চালের মাটির বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছিলেন **'তাল ধ্বজ'**। রবীন্দ্রনাথের তরুবিলাসী বন্ধু তেজেশ চন্দ্র সেন এই অভিনব গৃহ স্থাপত্যটি রচনা করেছিলেন। লোক স্থাপত্য সৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ তার অন্তর থেকে সমর্থন ও অভিবাদন জানিয়ে বনবাণী কাব্যে লেখেন 'কুটির বাসী' কবিতাটি। ১৯২৬ সালে বনবাণী প্রবন্ধে লিখেছিলেন, '***তাল ধ্বজ, এটি যেন মৌচাকের মতো নিভৃত বাসের মধু দিয়ে ভরা, লোভনীয় বলেই মনে করি। সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার ভেদ আছে। যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে, সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।***'

'উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা, 'সত্য উপলব্ধির প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথ তার স্থাপত্যে, পরিবেশে, ভাস্কর্যে, শিল্প, সংস্কৃতি, অন্তর-বাহিরের সর্বত্র, স্বদেশকে উপলব্ধি করে অকারণ জটিলতা পরিত্যাগ করার আহ্বান করেছিলেন। পাশ্চাত্য স্থাপত্যের অন্ধ অনুকরণের মাঝের শান্তিনিকেতন, উত্তরায়ণ স্থাপত্য পরিকল্পনা একটি ব্যতিক্রম রূপে প্রকাশ পায়। এখনকার সময়ে informal architecture, low cost housing, eco friendly living, open to sky space, eco logical land management, সেই সাথে পরিবেশ সংকট মোকাবেলায় যখন ব্যস্ত, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কর্মগুলোকে শুধু অনুভবই করেননি বরং শান্তিনিকেতনের মাটিতে প্রকৃতি, পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দেশজ, কালজ ও স্থানীয় ভূমির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য ও এর পরিবেশ তাই মানুষের চিরন্তন অনুভূতি, স্বাচ্ছন্দ্যকেই প্রকাশ করে।